Vol. 29 | No. 2 | 1986

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ও তাঁর 'লালসালু'

Volume	29
Issue	2
Year	1986
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	সৌদা আখতার
Published online	February 1, 1986
DOI	10.62328/sp.v29i2.5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v29i2.5
Pages	143-164
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ও তাঁর 'লালসালু'

সৌদা আখতার

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'লালসালু' (১৯৪৯) একটি বহুল আলোচিত উপন্যাস। তবে এসব আলোচনা উপন্যাসটির শৈল্পিক স্বরূপ সম্পর্কে কোন স্থির প্রত্যয় বা দৃষ্টিভঙ্গী নির্মাণ করেছে এমন বলা যায়না। বিভিন্ন সময়ে সমালোচকরা একে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তবে একটা ব্যাপারে সকলেই স্থির নিশ্চিত যে এখানে উপন্যাস নির্মাণের গতানুগতিক রচনাপ্রণালী অনুসৃত হয়নি। 'লালসালু'র বিশিষ্ট আঙ্গিক, চরিত্র নির্মাণের প্রত্যয়ী ভঙ্গী, সর্বোপরি বক্তব্যের সুগভীর ব্যঞ্জনা এবং তৎকালীন প্যান-ইসলামী পাকিস্তানী সমাজে তার সাহসিক উপস্থাপনা ঔপন্যাসিক জগতে ওয়ালীউল্লাহ্‌কে বিশেষভাবে চিহ্নিত করে। ওয়ালীউল্লাহ্‌র এই পরিচয়ের পশ্চাতে আছে তাঁর অনিষ্ট লক্ষ্যের পথে ভ্রূক্ষেপহীন এগিয়ে যাবার ঐকান্তিক সাধনার ইতিহাস। সাহিত্যিক হিসাবে ব্যক্তিগত রুচির পরিচর্যায় তিনি ছিলেন পরোৎকর্ষপন্থী (perfectionist) লেখক।[১] বার বার কেটে-ছিঁড়ে অনেক পরিকল্পনা-পরিমার্জনা শেষে সর্বোত্তম রূপ-নির্মিতিই হয় এ-জাতীয় লেখকদের স্বভাব। সুতরাং এদের মধ্যে অজস্রপ্রসূ লেখক সচরাচর চোখে পড়েনা। তবে আমাদের সৌভাগ্য এখানেই যে হাতে গোনা যে কটি রচনা তাঁর আছে তার প্রায় সবগুলিই কোন-না-কোন কারণে বিশিষ্ট।

বস্তুতঃ 'লালসালু' ঢাকায় প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪৯ সালের প্রথম দিকে। পরবর্তী এক দশক পর্যন্ত এ-উপন্যাসের সংবাদ খুব বেশী পাঠক-সমালোচকের জানা ছিল না। অর্থাৎ এই এক দশককাল পর্যন্ত গ্রন্থটি জনপ্রিয়তা লাভে ব্যর্থ হয়। সৈয়দ আবুল মকসুদ তাঁর 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবন ও সাহিত্য' গ্রন্থে এ-উপন্যাস জনপ্রিয় না হবার চারটি কারণ উল্লেখ করেছেন।[২] যেমন :

১. যদিও শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন এর প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন তবু সামগ্রিকভাবে বইটির অঙ্গসজ্জা তেমন আকর্ষণীয় ছিলনা ;

২. প্রকাশের পরপরই কার্যোপলক্ষে ওয়ালীউল্লাহ্ প্রথমে করাচী বেতার কেন্দ্রে এবং পরে নয়াদিল্লী বদলী হয়ে যান। তাতে করে বইটির প্রচারের ব্যাপারে তিনি খুব সামান্যই সময় দিতে পেরেছিলেন ;

৩. উপন্যাসটির কোন উল্লেখযোগ্য সমালোচনাও কোন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি ; এবং

৪. উপন্যাসটির কাহিনী ও বিষয়বস্তু এবং তৎকালীন রাজনৈতিক সামাজিক অবস্থাই এর জনপ্রিয়তা অর্জনের পথে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

সৈয়দ আবুল মকসুদ প্রদত্ত এই কারণগুলোকে আসলে উপন্যাসটি জনপ্রিয় না হবার বাহ্যিক কারণ হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। এ-প্রসঙ্গে জনপ্রিয় বাংলা উপন্যাসের ট্র্যাডিশান স্মরণ করা যায়। ইতিপূর্বে বাঙালী পাঠকের কাছে শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাস বিপুলভাবে সংবর্ধিত হয়। অথচ তাঁর কোন উপন্যাসেরই প্রচ্ছদ খুব আকর্ষণীয় বা সংবাদপত্রে তার ভুরি ভুরি প্রশস্তি-সমালোচনা লিখিত হয়েছে এমন নয়। অর্থাৎ প্রচার মাহাত্ম্যে শরৎচন্দ্র জনপ্রিয় হননি। আসলে তাঁর বর্ণনামূলক আকর্ষণীয় গল্পকথন ভঙ্গিটির সঙ্গে পাঠক সহজেই একাত্ম বোধ করত। শরৎচন্দ্রের একটি সদ্য-লিখিত উপন্যাস বাজারে এসেছে—পাঠ করার জন্য একজন সাধারণ পাঠকের কাছে এই সংবাদটিই যথেষ্ট ছিল। এমন কি তিরিশোত্তর কোন কোন ঔপন্যাসিককেও সাধারণ পাঠক এমনিভাবে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু ওয়ালীউল্লাহ্র বেলায় এ-রকম হয়নি। কারণ পূর্বেই বলা হয়েছে যে তাঁর উপন্যাস প্রচলিত রচনাধারার নির্মিতি নয়। কোলকাতার রসজ্ঞ পাঠক-সমালোচক এ-উপন্যাসকে সাদরে গ্রহণ করেনি সম্ভবত এর মুসলিম পরিবার-কেন্দ্রিক প্রতীকী কাহিনীর কারণে। অন্যদিকে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানে বিদগ্ধ পাঠক-সমালোচক শ্রেণীও গড়ে ওঠেনি। সম্ভবতঃ এ-কারণেই 'লাল-সালু' প্রথম প্রকাশের পর এক দশক পর্যন্ত যথাযোগ্য সমাদর পায়নি। কিন্তু এরপর 'লালসালু' ফরাসী ভাষায় অনূদিত ও প্রশংসিত হয়েছে, এ-সংবাদে বাঙালী পাঠক সচেতন হয়ে ওঠে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ১৯৬০ সালে ঢাকার

'ঝথাবিতান' এ-উপন্যাসের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করে এবং ১৯৬১ সালে বাংলা একাডেমী 'লালসালু'কে পুরস্কারে ভূষিত করে। এর কিছুকাল পরেই ওয়ালীউল্লাহ্‌র সহধর্মিনী অ্যান-মারি-থিবো, জেফ্রি জিবিয়ান, কায়সার সাঈদ এবং মালিক খৈয়াম—এই চারজন মিলে 'লালসালু'কে ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। নাম দেয়া হল 'Tree Without Roots', তবে এই ইংরেজী ভাষ্যটি আসলে সম্প্রসারিত 'লালসালু'। এবং এই সম্প্রসারণের গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করেছেন স্বয়ং ওয়ালীউল্লাহ্।

সাধারণভাবে এ-উপন্যাসে সমাজ-বাস্তবতার একটি বিশেষ দিকের পরিচর্যা পাওয়া যায়। তবে সমকালের সদ্য-বাত্যাক্ষুব্ধ সমাজ-আবহ এখানে প্রতিফলিত হয়নি। বরং লেখক যেন এইসব উত্থান-পতন-সংকুল রাজনৈতিক প্রমত্ততা থেকে হৃদয় উন্মূল করে চলে এসেছেন গ্রাম বাংলার প্রত্যন্তের এক নিস্তরঙ্গ অধঃপতিত জনসমাজে। এর পটভূমিতে আছে ইংরেজ শাসনের সমাপ্তি পর্বের অবক্ষয়ধর্মী গ্রাম্য-সমাজের বাস্তব চিত্র। একটি মাত্র চরিত্রের আবির্ভাব উদ্ভাসন ও ক্রমপরিণতিতে এর কাহিনী বৃত্তায়িত। কাহিনীর ব্যাপ্তি এখানে অজস্র চরিত্রের প্রকাশ-সম্ভাবনাকে উৎসাহিত করেনি। বরং সর্বত্র মজিদ এবং শেষ দিকে প্রতিবাদী জমিলার বলিষ্ঠ উপস্থিতি কাহিনী-লোলুপ পাঠকের আকাঙ্ক্ষায় ভারসাম্য আনে। প্রথাসিদ্ধ রুদ্ধ-নিঃশ্বাস কাহিনী-প্রধান উপন্যাসের পরিবর্তে তিনি এমন একটি ব্যতিক্রমী উপন্যাস নির্মাণ করেন যার জন্য সমসাময়িক বাঙালী পাঠক ঠিক প্রস্তুত ছিল না। চল্লিশের দশকে কোলকাতায় বসে তিনি যখন এ-উপন্যাস রচনা করেন তখন সেখানকার সাহিত্য পরিমণ্ডল তিরিশোত্তর তরুণ ঔপন্যাসিকদের প্রিয় প্রসঙ্গ রোমাণ্টিকতা ও যৌনতায় কল্লোলিত হচ্ছে। তৎকালে বাংলা সাহিত্যে ইউরোপীয় আধুনিকতার বীজ প্রথম বপন করেন 'কল্লোল' ও 'কালিকলম' গোষ্ঠীর লেখকরা। সাহিত্য বিকাশের সহজ স্বাভাবিক গতিধারায় এ-আধুনিকতার আমদানী হয়নি। এ-কারণে এ-সব নবীন লেখক দ্বারা যে আধুনিকতার সূত্রপাত হয় তা ছিল কৃত্রিম। সমালোচকের মতে :

> তাদের (কল্লোল গোষ্ঠীর) উদ্দীপনাটা এসেছিল বিদেশী বইয়ের দুনিয়া থেকে, নীচুতলার মানুষদের উপরে যে আলো তারা ফেলেছিলেন তা রঙীন আলো, আপন দেশ ও সমাজের মাটি থেকে সত্যিকার মানুষকে তাঁরা ছেঁকে তোলেন নি।[৩]

কিন্তু ওয়ালীউল্লাহ্‌র মননশীলতা সহমর্মীদের সঙ্গে এই জাতীয় আধুনিকতায় শরীক হবার মত ছিলনা। জীবনবোধের ভিন্নতার কারণেই তিনি উপন্যাস-শিল্পে আনলেন ভিন্নতর স্বাদ, নতুনতর উপলব্ধি। তিনি ছিলেন সত্যিকার অর্থে গোঁড়া বাঙালী। রোমাণ্টিক কুয়াশাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে নয়, তিনি সহজ সত্যের নির্ভেজাল আলোক-সম্পাতে গ্রামবাংলার অবহেলিত জনসমাজকে দেখেছেন। তাই তাঁর ছোটগল্পে, উপন্যাসে যে মানুষদের চিত্র অঙ্কিত তারা আমাদের এত চেনা। তাঁর প্রেরণা ছিল এদেশের প্রাকৃতজন। তাঁর সামনে ছিল এদেশের কুসংস্কার-লাঞ্ছিত ভীরু গ্রাম্য-জীবন। তাঁর উপন্যাস, নাটক এবং ছোটগল্পের কোথাও গ্রাম-চৈতন্য তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাবে কৃত্রিম বা অনুজ্জ্বল নয়। অভিজ্ঞতা-প্রসূত বলেই তাঁর রচনায় প্রযুক্ত বাস্তবতা কখনো 'কল্লোল গোষ্ঠী'র লেখকদের মত 'মধ্যবিত্তের রোমাণ্টিক ভাবাবেগ'[৪]-এ পরিণত হয়নি। 'কল্লোল গোষ্ঠী'র কোন কোন লেখকের রচনায় 'মানস পরিব্রাজনা'[৫] লক্ষ্য করা গেলেও তার অনুশীলন খুব বেশী পরিপক্কতা লাভ করতে পারেনি। কিন্তু ওয়ালীউল্লাহ্‌র রচনা এই মানস পরিব্রাজনার মধ্য দিয়ে পাশ্চাত্য দর্শনের এক অপরিচিত জটিল ভূমিতে প্রবেশ করেছে। 'লালসালু'র ইংরেজী অনুবাদের সম্প্রসারিত অংশে স্পষ্টতঃই এ-কথার প্রমাণ আছে—

> কাফ্‌কা-ক্যামু-সার্ত-এর উপন্যাসগুলোর মত TWR (Tree Without Roots) শৈল্পিক কারুকাজের দিক থেকে জটিল না হলেও শেষ পর্যন্ত নিঃসন্দেহে একটি সরল অস্তিত্ববাদী উপন্যাসে রূপ নিয়েছে।[৬]

কাফ্‌কা-ক্যামু-সার্ত-এর মত কোন বিশিষ্ট দার্শনিক মতবাদ প্রচার ও প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ওয়ালীউল্লাহ্‌ উপন্যাস রচনা করতে বসেননি। এ-ছাড়া যুদ্ধোত্তর ইউরোপের আবর্ত-সংকুল সমাজ-প্রতিবেশেও তিনি বাস করেননি। কিন্তু তাঁর অজান্তেই তাঁর বিশিষ্ট মানস-প্রবণতা এ-উপন্যাসে এমন ছায়া-সম্পাত ঘটিয়েছে যা দূরায়ত ভাবে অস্তিত্ববাদী দর্শনের লক্ষণাক্রান্ত। এবং লক্ষণাক্রান্ত ছিল বলেই পরবর্তীকালে—

> ভাষান্তরিত করার সময় অনুবাদিকা সার্ত-অনুরাগী অ্যান-মারি এবং মূল লেখক উভয়েই সচেতন ভাবে অস্তিত্ববাদী দর্শনের শক্ত তক্তার ওপর 'লালসালু'কে স্থাপন করেন।[৭]

অপরদিকে ওয়ালীউল্লাহ্‌র সমসাময়িককালের মুসলিম সাহিত্যিক এবং সুহৃদবর সৈয়দ নূরুদ্দীন, গোলাম কুদ্দুস, আবুল হোসেন, শওকত ওসমান প্রমুখের রচনাধর্মের সঙ্গে তুলনা করলে তাঁর সাহিত্যকর্মের অর্থঘন মননশীলতার বিশেষত্ব উপলব্ধি করা যায়। এ-উপন্যাসের কেন্দ্রীয় ভাববস্তু তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশের অনুকূল ছিল না। সে-সময় 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তানে'র ফিউডাল মনোবৃত্তি সম্পন্ন নেতৃস্থানীয়দের যাবতীয় পরিকল্পনার শেকড় ছিল এদেশের গ্রাম্য-সমাজে প্রোথিত। বিশেষ করে গ্রাম্য মোল্লাশ্রেণীর মানুষেরাই তাদের নৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তির অন্যতম ভিত্তি ছিল। ইসলাম ধর্মের যে ভাবাদর্শ ও বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হয় 'লালসালু'র কাহিনীর মধ্যবিন্দু সেই ভাবাদর্শকে ব্যঙ্গ করেছে এবং গ্রামাঞ্চলের অশিক্ষিত মোল্লাশ্রেণীর একাংশের যথার্থ স্বরূপ উন্মোচন করেছে। সমকালের একলক্ষ্যে প্রবাহিত বেগবান রাজনীতির প্রেক্ষাপটে তাই লেখকের ভূমিকা ছিল 'দুঃসাহসীর'[৮]। তখনো নব্য-স্বাধীন পাকিস্তানের বাঙালী মুসলমান রাজনৈতিক প্রয়োজনে সদ্য-জাগ্রত ধর্মীয় উন্মাদনার নেশাগ্রস্ততা থেকে মুক্তি পায়নি। ফলে সে-সময়কার সাধারণ পাঠকের কাছে স্বাভাবিক সহজবোধ্য কারণেই এ-উপন্যাস সমাদর পায়নি। মধুসূদনের মত ওয়ালীউল্লাহ্‌ও তাঁর সময়কালের চেয়ে আরো এগিয়ে ভিন্নধর্মীয় প্রাগ্রসর জীবনবোধ ও সামাজিক সংস্কার-বিশ্বাসকে তাঁর সাহিত্য-কর্মে রূপদান করেছেন। ওয়ালীউল্লাহ্ অবয়বে ছিলেন 'দীপ্ত-সুদর্শন'। তৎকালের শালীন ও সম্ভ্রান্ত পত্রিকা 'ষ্টেটসম্যানে'র মতই উন্নত ও রুচি-ঋদ্ধ ছিল তাঁর মননভঙ্গী। এ-পত্রিকার সাব-এডিটররূপে তাঁর সংযোগ-সহযোগ ছিল পত্রিকার সম্পাদক প্রেসিডেন্সী কলেজের ইংরেজীর শিক্ষক মি. ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও সহ-সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে। এই তিনজন একত্রে সেখানে যেন "একটি রুচিবান আনন্দলোক নির্মাণ করেছিলেন"।[৯] এই নগর-কেন্দ্রিক বিদগ্ধ সুরুচিপূর্ণ পরিমণ্ডলে বিচরণ করেও তিনি লিখলেন 'লালসালু', যার অন্তর্লোকে বিম্বিত হল অখ্যাত-অজ্ঞাত নিশ্চেতন গ্রাম্যসমাজ।[১০] এই সমাজে তাঁর বিচরণ ছিল ছেলেবেলায়। সম্ভবত সেই স্মৃতি-চিত্র তাঁর চিত্তে প্রগাঢ় ছায়াপাত করে। তাই যৌবনে বিদগ্ধ সহকর্মীদের সাহচর্যে বাস করেও জীবন-দৃষ্টির তীক্ষ্ণতায় তিনি গ্রাম্য অভাজনদের মনোভূমে পৌঁছেছেন শিকারীর অব্যর্থতায়। ইউরোপীয় শিল্প-সাহিত্য-দর্শনকে নিজস্ব ভঙ্গীতে আত্মস্থ করে তিনি তাকে শব্দস্ফুট

করে তুলেছেন বাংলার গ্রামীণ পটভূমিতে। তাঁর এই অগ্রযাত্রার সূচনা হয় 'লালসালু' উপন্যাসে। এখানে বাংলাদেশের একটি বিশেষ অঞ্চলের রূপ-বৈশিষ্ট্য বৈচিত্র্যমণ্ডিত হয়ে ধরা পড়েছে। বিভাগোত্তরকালে গ্রামীণ সমস্যাভিত্তিক আরো কিছু উপন্যাস প্রকাশিত হয়। এগুলোর মধ্যে স্মরণযোগ্য রচনা হল শওকত ওসমানের 'জননী', শহীদুল্লা কায়সারের 'সারেং বৌ,' আবু ইসহাকের 'সূর্যদীঘল বাড়ী', শামসুদ্দীন আবুল কালামের 'কাশবনের কন্যা' ইত্যাদি। ন্যারেটিভ রচনাভঙ্গী এ-উপন্যাসগুলোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মনে হয় রচনাকারদের সবার দৃষ্টিই কাহিনী-বয়ন ও তার জটিলতা উন্মোচনের সনাতন পথের প্রতিই নিবদ্ধ ছিল। কিন্তু এ-দিক থেকে ওয়ালী-উল্লাহ্‌র রচনা সচেতনভাবে পৃথক সারির সাহিত্যকর্ম। 'লালসালু' পাঠক-পরিমণ্ডলে তার সাধারণ আবেদন ছাড়াও সুনির্দিষ্টভাবে একটি ব্যতিক্রমী বোধের সঞ্চার করতে সক্ষম। এখানে লেখকের কৃতিত্ব তাঁর দৃষ্টির স্বচ্ছতায়, দ্বিধাহীন বক্তব্যে এবং জীবনদৃষ্টির ভিন্নতর অভিব্যক্তিতে বিধৃত। এ-উপন্যাসে লেখকের জীবনদৃষ্টি শুধু আধুনিক নয় বলা যায় আধুনিকতম। কারণ তিনি ইউরোপীয় উপন্যাস শিল্পের একটি সাম্প্রতিকতম ধারাকে আবহমান কালের বাংলার গ্রামীণ প্রতিবেশে উপস্থাপন করেছেন। অস্তিত্ব-বাদী দর্শনকে ভিত্তি করে উপন্যাস রচনার পূর্ব-প্রস্তুতি হিসেবে ইউরোপীয় উপন্যাসের ক্ষেত্রে যে-ধরনের ভূমি কর্ষণের আয়োজন করা হয়েছে, বাংলাদেশের উপন্যাসের ক্ষেত্রে তা হয়নি। এদেশের গতানুগতিক কাহিনী-ধর্মী বর্ণনামূলক উপন্যাসের বিচরণভূমিতে ওয়ালীউল্লাহ্‌র নতুন আঙ্গিক ও মননের সংযোগ তাই একান্তই আকস্মিক, অভাবিত। ইউরোপের নতুন দিগ্বলয়াভিমুখী ক্রমপরিবর্তনশীল সাহিত্যাদর্শের সঙ্গে ঘনিষ্ট যোগাযোগহীন সাধারণ পাঠকের পক্ষে ওয়ালীউল্লাহ্‌র প্রতীক-ব্যঞ্জনাময় রচনার রসোপলব্ধি কষ্টকর। বস্তুতঃ ওয়ালীউল্লাহ্‌র রচনার রসাস্বাদনের জন্য পাঠকের নিজেরই পূর্ব-প্রস্তুতি প্রয়োজন। সে-কারণে একমাত্র বিদগ্ধ পাঠক ছাড়া তাঁর উপন্যাস-গুলো সাধারণ পাঠকসমাজে কখনো সমাদর পাবে কিনা সন্দেহ। আর তাই রচনায় উৎকর্ষ ও ক্ষমতার পরিচয় থাকা সত্ত্বেও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মত সর্বজনপ্রিয় ঔপন্যাসিকের মর্যাদা তিনি পাবেন না, এমন আশঙ্কা সত্য। কারণ সাধারণ পাঠক চায় একটি জমাট গল্প, গল্পে লভ্য চরিত্রের উত্থান-পতন, চায় নাটকীয় ঘটনাবলী। কিন্তু গল্পাতিরিক্ত গভীর তাৎপর্যবহ মূল্যবান রসাস্বাদনের জন্য স্বল্পশ্রমেও তাদের ঘোরতর আপত্তি।

অধিকাংশ সমালোচক উপন্যাস রচনায় যে গতানুগতিক শিল্পরীতি ব্যবহৃত হয় সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই 'লালসালু'কে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু মনে হয় ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁর পরবর্তী উপন্যাসদ্বয়ে সুনির্দিষ্টভাবে যে শিল্পরীতি ব্যবহার করেছেন 'লালসালু'কেও সেই দর্শনের নিরিখে একটি সন্তোষজনক ব্যাখ্যার আওতায় আনা সম্ভব। পরিষ্কারভাবে না হলেও এ-উপন্যাসের মৌল-চিন্তায় অস্তিত্ববাদী উপাদান ব্যবহৃত। অপরিচিত দর্শনের সুকঠিন প্রেক্ষাপট পশ্চাতে থাকলেও এ-উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্র এসেছে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অনভিজাত প্রাকৃত জনসমাজ থেকে। এদের সবাই তাঁর চেনা-জানা, অতি পরিচিতি। অথচ এই চেনা-জানা চরিত্রগুলোর সঙ্গে এখানে যুক্ত হয়েছে নতুন মাত্রিকতা, নবতর সম্ভাবনা। ওয়ালীউল্লাহ্র শৈশব-কৈশোর অতিক্রান্ত হয়েছিল বাবার সঙ্গে মফঃস্বলে ঘুরে ঘুরে। মানিকগঞ্জ, মুনশীগঞ্জ, ফেনী, হুগলীর মত অঞ্চলের সঙ্গে ছিল তাঁর ঘনিষ্ট পরিচয়। ফলে সৌখীন সাহিত্য-কর্মীর মত গ্রাম্য পরিবেশ ও জীবনচেতনা সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা শেকড়বিহীন উপরাঞ্চলীয় নয়। একটা বয়সে গ্রামের প্রকৃতি ও গ্রাম্য-মানুষের সঙ্গে ছিল তাঁর প্রগাঢ় সংযোগ। এ তিনি কখনোই ভুলে যাননি। এর পরিচয় আছে 'লালসালু' উপন্যাসে। এমন কি তাঁর পরবর্তী উপন্যাসদ্বয়েও এ-পরিচয় দুর্লভ নয়। 'চাঁদের অমাবস্যা' এবং 'কাঁদো নদী কাঁদো'র পটভূমি ও চরিত্রগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে বোঝা যায় যে ফ্রান্সের মত দূরদেশে প্রবাস-জীবন কাটালেও তিনি কখনোই গর-ঠিকানা হননি। আজীবন দেশ তাঁর মর্মমূলে আমূল বিদ্ধ ছিল।[১১] 'লালসালু' উপন্যাসে মহব্বতনগর নামে যে গ্রামের ছবি তিনি নির্মাণ করেছেন, তাকে বাংলাদেশের যে-কোন গ্রামের চিত্ররূপময় মানচিত্রের সঙ্গে মিলিয়ে নেয়া যায়। গ্রামের ছোট খাটো ঘটনা বা পরিবেশ এত নিখুঁতভাবে তাঁর উপন্যাসে স্থান পেলেও পশ্চাতে আছে তাঁর বিদগ্ধ শিক্ষিত নাগরিক শিল্প-চেতনা।[১২] গ্রাম বাংলার অতি পরিচিত জন-জীবনকে উপজীব্য করেছেন বলে এ-উপন্যাসের যেমন একটি সহজবোধ্য আবেদন আছে তেমনি এর গুটিকয় চরিত্রে অস্তিত্ববাদী চিন্তাধারার আংশিক প্রতিফলন এ-উপন্যাসকে দিয়েছে ভিন্নতর ব্যঞ্জনা। ধর্ম নিয়ে সজ্ঞানে বেসাতি করার কাহিনী নিয়ে ইতিপূর্বেও সাহিত্য রচিত হয়েছে। কিন্তু কাহিনী পরিবেশনের ব্যতিক্রমী ভঙ্গীর কারণে এ-উপন্যাস পাঠকের প্রত্যাশাকে নতুন দিগন্তের সন্ধান দেয়। তবে এখানে সমাজ-সমীক্ষার যে রূপায়ণ তা পদ্ধতিগত দিক থেকে

অনেকটাই ঐতিহ্যানুসারী। অর্থাৎ ইতিপূর্বেও গ্রাম্য-সমাজের বিভিন্ন সমস্যার প্রতি ঔপন্যাসিকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। এদিক থেকে 'লালসালু' কোন ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু কাহিনী ও চরিত্রের প্রতীকী ব্যঞ্জনা এ-উপন্যাসকে দিয়েছে ভিন্নধর্মীয় অভিব্যক্তি। এ-উপন্যাসের প্রারম্ভ ও শেষের ইঙ্গিতময়তা সমকালীন অন্য উপন্যাসগুলোয় লভ্য নয়। গ্রাম-জীবনের একটি বিশেষ অংশে তার চিন্তনের সার্চ লাইট আমাদের এক নতুন সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়।

প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে ধর্ম কখনো কখনো কিছু মানুষের জীবিকার উৎস হয়ে দাঁড়ায়। সে-সুযোগ অবশ্য এ-দেশের কাদামাটির মত নরম নিম্নবিত্ত-বিত্তহীন মানুষেরাই করে দেয়। তাই মজিদ প্রাণ ধারণের প্রচণ্ড তাগিদে তার আজীবন শিক্ষা-দীক্ষা সংস্কার-বিশ্বাস সব কিছুকে গোরস্থ করে ধর্মকে সজ্ঞানে পণ্য করে তোলে। নিজের বিপন্ন অস্তিত্ব রক্ষার আগ্রহে এ-সিদ্ধান্ত তাকে নিতে হয় নিতান্ত বাধ্য হয়ে। অস্তিত্ববাদীরা বলেন মানুষ সংকটে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। হয় এ-পথ, নয় ও পথ—কিছু একটা তাকে বেছে নিতেই হয়। সিদ্ধান্ত সে গ্রহণ করে দ্বিতীয় কারুর সাহায্য ব্যতিরেকে একাকী। এবং এ-সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে সে কারুর কাছে দায়ী নয়। মানুষ যখন বিপর্যয়ে পতিত হয় তখন নিজের তথা সমগ্র মানব-সমাজের অনুকূল সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রাক্কালে সে নিজের অস্তিত্বকে উপলব্ধি করে। মানব অস্তিত্বের এই উপলব্ধি শুধুমাত্র ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই আহরণ করা সম্ভব। একে বুদ্ধি দিয়ে যুক্তি দিয়ে বিজ্ঞান দিয়ে কোনক্রমেই ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়।[১৩] অস্তিত্ববাদী সাহিত্যিকরা ব্যক্তি-মানবের অস্তিত্বের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে যে চরিত্রগুলোকে আশ্রয় করেন এরা সব সময় বৈরী জগৎ-এর সঙ্গে, বিরুদ্ধ প্রতিবেশের সঙ্গে অনবরত সংগ্রাম করে যায়। উদাহরণ হিসেবে আলবেয়ার ক্যামুর 'দি প্লেগ' উপন্যাসের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। বিরূপ পরিবেশে ভয়-আতংক-মৃত্যু সবকিছুকে দূরে সরিয়ে এর নায়ক অদ্ভুত নির্লিপ্ততায় দায়িত্ব পালন করে যায়। এমন কি স্ত্রীর মৃত্যুও ডা. রিয়োকে এই দায়িত্ব থেকে মুহূর্তের জন্যও বিচলিত করেনি। অস্তিত্ববাদীদের বিশ্বাস মানুষ শুধু তার ব্যক্তিগত অস্তিত্বের জন্য দায়ী নয়—প্রতিটি ব্যক্তি-মানুষ তার ব্যক্তিগত অস্তিত্বের পাশাপাশি সমগ্র মানব-জাতির দায়িত্ব বহন করে। ব্যক্তি-মানুষকে তার এই বৃহৎ দায়িত্ব সম্পর্কে সজাগ করে দেওয়াকে সার্ত তার কর্তব্য বলে মনে করেছেন। তাঁর তিন খণ্ডে

সমাপ্ত এপিক উপন্যাস 'দি ওয়েজ অব ফ্রিডম'-এ তিনি এই কথাটিকেই পূর্ণাঙ্গভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাসে আমরা অস্তিত্ববাদের গভীর ও প্রগাঢ় কোন ব্যাখ্যা পাইনা, যা ক্যামু বা সার্তের সঙ্গে তুলনীয়। কিন্তু মনে হয় ওয়ালীউল্লাহ্ পাশ্চাত্যের এই দর্শনের গূঢ় তাৎপর্য সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন অথবা তাঁর মানস-প্রবণতা এই দর্শনের মূলসূত্রের অনুকূল ছিল তাঁর অজ্ঞাতসারেই। যার জন্য তাঁর প্রথম বয়সের রচনা 'লালসালু'র কোন কোন চরিত্রে আমরা অস্তিত্ববাদের কিছু বিক্ষিপ্ত লক্ষণ আবিষ্কার করি। মজিদ ব্যক্তিগত অস্তিত্ব রক্ষার এক সংকটময় মুহূর্তে একাকী সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্য দিয়ে মহব্বতনগর গ্রাম ও নতুন জীবনের তোরণ পথে প্রবেশ করে। নিজের কর্ম-সাধনার উপর প্রচণ্ড বিশ্বাস ছিল তার; আর হতদরিদ্র গ্রাম-বাসীদের জীবনাভ্যাস ও চরিত্র সম্পর্কে গভীর অন্তর্দৃষ্টি। তার বিশ্লেষণধর্মী দূরদর্শী মন তাকে এ-দুঃসাহসে প্রেরণা দিয়েছে। পরবর্তী ক্রিয়াকলাপে তাঁর এই মনের শক্তি বার বার প্রমাণিত। পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে সে জানে গ্রামের দরিদ্র কৃষককুল জাগতিক দুঃখ-লাঞ্ছনা আবেগ-আনন্দের ক্রিয়াকর্ম নিয়ে এতই ব্যতিব্যস্ত থাকে যে তারা চায় ওদের হয়ে আর কেউ ওদের পারলৌকিক মঙ্গলের কাজগুলো করে দিক। এরা তাড়িত হয় এক অযৌক্তিক অন্ধ অপ্রতিরোধ্য ধর্মানুরাগ দ্বারা। ধর্মের গুহ্য-দর্শন নয় বরং তার আনুষ্ঠানিকতার প্রতিই তাদের আকর্ষণ অধিক। তাদের এই মনোবৃত্তিই ধর্ম-বণিকদের প্রতারণার পরিবেশ তৈরী করে দেয়। নিতান্ত বোধ্য কারণেই অদৃশ্য খোদা তালা অপেক্ষা দৃশ্যমান ধানক্ষেত তাদের সেবা ও মনোযোগ এতবেশী ও এত প্রবলভাবে দাবী করে যে ধর্মের জটিলতা বা তার রহস্যময় গভীরতা নিয়ে মাথাব্যথার অবকাশ তারা খুব কমই পায়:

> চেনে জমি আর ধান, চেনে পেট। খোদার কথা নেই। মনে করিয়ে দিলে আছে নচেৎ ভুল মেরে থাকে। জমির জন্য প্রাণ। সে জমিতে বর্ষণহীন খরার দিনে ফাটল ধরলে তখন কেবল স্মরণ হয় খোদাকে।[১৪]

এদের ধর্মবোধ যেন পাকস্থলীর বেষ্টনী ছেড়ে মস্তিষ্কের তরঙ্গে উঠে আসার অবকাশ পায়না। শুধু অসহায় প্রতিবেশে একজন কোন ত্রাণকর্তার প্রসঙ্গ তাদের স্মরণ হয়। অনেকটা যেন অভ্যাস ও আজন্ম সংস্কারের ফলেই। এরা বিশ্বাসপ্রবণ। তাই প্রশ্নহীন ভাবে সমাজ ও সমাজ-পরিচালকদের সব নির্দেশ মেনে নেয়। এরাই মিলিতভাবে জনতা (mass) শ্রেণী গঠন করে।

এদের ব্যক্তি স্বাধীনতা খণ্ডিত। বাহ্যিক শক্তি বা কোন প্রতিষ্ঠান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এই জনতাশ্রেণী অস্তিত্ববাদী চিন্তার স্বাধীন স্বাভাবিক মানুষ নয়। কিন্তু এই জনতা থেকেই আবার দায়িত্ববান স্বাধীনচেতা ব্যক্তিমানুষ দুয়েকজন হঠাৎ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। মহব্বতনগরের মানুষ পূর্বে খালেক ব্যাপারীর আদেশ-নির্দেশে নিয়ন্ত্রিত-পরিচালিত হত। কিন্তু গ্রামে মজিদের পদপাতের পর থেকে কি এক রহস্যময় কারণে তারা ধীরে ধীরে মজিদের নির্দেশ মত চলতে শুরু করে। মজিদ চতুর, মজিদ শিকারী, মজিদ তার সিদ্ধান্তে দৃঢ়মূল। সচেতনভাবে সে মহব্বতনগরের এক ভগ্ন অবহেলিত প্রাচীন কবরকে জনৈক মোদাচ্ছের পীরের মাজার বলে সম্প্রচার করে। কবরটিকে এতকাল অবহেলা করার কারণে প্রচণ্ড গালাগালির মধ্য দিয়ে সে গ্রাম-বাসীকে বিধর্মী ও দোষী সাব্যস্ত করে। জাগতিক কর্মযজ্ঞে ব্যস্ত ও তার গলাবাজিতে বিভ্রান্ত গ্রামবাসী তা মেনে নেয়। এমনকি তারা বিব্রত ও লজ্জিত বোধ করে। তারা মজিদের অকস্মাৎ এই গ্রামের আগমনের কারণ বা তার পরিচিতি নিয়ে প্রশ্ন করেনা; ভগ্ন কবরের অতীত ইতিহাস আবিষ্কারেও সন্ধানী হয়না। পুরুষ-পরম্পরায় যে সংস্কার-বিশ্বাস তারা রক্তের ধারায় বহন করে চলে তার মূলানুসন্ধানেও আগ্রহী হয়না। পিতৃ-পুরুষেরা ধর্ম মেনেছে। ধর্মের অবশ্য-করণীয় শর্তগুলো পালন করেছে। সুতরাং অভ্যাসবশতঃই তারা প্রাত্যহিক ক্রিয়াকর্মের মতই ধর্মীয় আচরণ-গুলো অনুকরণ করে। কৃষক-জনতার অন্তর্মানসের এ-সংবাদ মজিদের জানা ছিল। তাই তার পক্ষে আবাল্য নিবাস ছেড়ে মহব্বতনগরের অপরি-চিত প্রতিবেশে আত্মপ্রতিষ্ঠার স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয়েছে। বেঁচে থাকার অপ্রতিরোধ্য অমোঘ জৈব তাড়নায় ধর্মকে পণ্য করে হৃদয়ে তার দহন ছিল। ভয় ও দ্বিধা ছিল। এখানেই চরম আত্মপ্রত্যয়ী মজিদ, নির্বিকার শিকারী মজিদ একজন যথার্থ মানুষ, বিশ্বস্ত মানুষ[১৫] হয়ে উঠেছে। আত্মপ্রতিষ্ঠার দুর্বার সংগ্রামে নিয়ত মজিদ তাই কখনো কখনো ভেঙে পড়ে। এমন কি মনের গহীনের গ্লানিবোধ থেকে মুক্তির অন্বেষায় দুর্বল মুহূর্তে সে ক্ষমা প্রার্থনা করে:

> খোদার বান্দা সে নির্বোধ ও জীবনের জন্য অন্ধ। তার ভুলভ্রান্তি তিনি মাফ করে দেবেন। তাঁর করুণা অপার সীমাহীন।[১৬]

মনে মনে খোদার কাছে মাফ চাইলেও বাস্তবে একটি ভগ্নপ্রায় কবরের 'লালসালু' কাপড়ের ছত্রচ্ছায়ায় মজিদের ক্রমান্বয় সাংসারিক শ্রীবৃদ্ধি সহজেই

দৃষ্টিগোচর হয়: "ক্রমে ক্রমে মজিদের ঘরবাড়ী উঠল। বাহির ঘর অন্দর ঘর আওলা ঘর গোয়াল ঘর। জমি হল। গৃহস্থালী হল।"[১৭]

দুধে-ভাতে পরিতৃপ্ত মজিদ গারো পাহাড়ের শ্রমক্লান্ত দিনের স্মৃতিতে শিউড়ে ওঠে। সাধারণ কৃষক যখন ধানক্ষেত আর জীবনের মত কঠিন মৃত্তিকার সঙ্গে অচ্ছেদ্য সংগ্রামে ব্যতিব্যস্ত তখন মজিদ কণ্ঠে দোয়া-দরুদের চিকন সুর তোলে। কিন্তু তা ধর্মানুরাগ অপেক্ষাও যেন নিজের ক্ষমতা-প্রতিপত্তি অক্ষুন্ন রাখার প্রচেষ্টায়। সে সর্বমুহূর্ত সতর্ক উৎকণ্ঠিত। কৃষিজীবী এই জনতা যদি তাকে প্রশ্ন করে বসে তবে তার প্রতারণার ভিত্তি নড়ে প্রতিষ্ঠার সৌধমালা গুঁড়িয়ে যাবে ধূলোয়। অন্তর্গূঢ় সত্তায় তার জানা আছে, যে সম্মান ও প্রতিপত্তি আজ অনায়াসে করতলগত সহজ মৃত্তিকা-সংগ্রামে তা লাভ করা যেতনা। তার সকল ক্ষমতার শেকড় প্রোথিত তার অন্তঃ-সারশূন্য ধর্মব্যবসার মাটিতে। মজিদ তা জানে। তাই কখনো কখনো এক ধরনের ভীতি দ্বারা সে তাড়িত হয়। এই ভীতিই তাকে প্রতিহিংসাপরায়ণ করে তোলে। সামান্যতম অবহেলাও তার চোখে পড়ে। তখন মজিদ যেন ফিউডাল সমাজের প্রতিভূ। যারাই তার বিরুদ্ধে সামান্যতম অঙ্গুলী তুলেছে তাদেরকেই সে ক্রূর হিংস্রতার তীক্ষ্ণ ছোবলে নিঃশেষ করে দিয়েছে। তার প্রথম শিকার তাহেরের বাপ। এখানে সে সফল সামন্ত দণ্ডধর। এরপরেই নিরপরাধ আমেনা তার নিভৃত-আকাঙ্ক্ষার পাপে মজিদের প্রতিহিংসা ও অবচেতন লালসার কোচবিদ্ধ যন্ত্রণাক্ত অস্তিত্ব নিয়ে অন্তর্হিত হয়। পাশের গ্রামের পীর হয় লাঞ্ছিত। এমন কি তার একান্ত হৃদয়-সন্নিকটবর্তী রহিমা লাভ করে সতীন। তার অবদমিত যৌনাকাঙ্ক্ষা সন্তান কামনার মোড়কে হয়ে ওঠে কিশোরী জমিলা। কিন্তু তবু কি মজিদ স্বস্তি লাভ করেছে? প্রতারণার অগ্রযাত্রায় মজিদ সহযাত্রীহীন একাকী, নিঃসঙ্গ। তাই কি তার হৃদয়ে নিঃসঙ্গতা ও শূন্যতার অবিরাম ক্রন্দন? মজিদ তার এই সংগুপ্ত যন্ত্রণার ক্রুশ একাকীই বহন করে যায়। একান্ত স্বজন রহিমার কাছেও হৃদয় খুলে সান্ত্বনার জন্য দাঁড়াতে পারেনা। জীবিকার্জনের প্রয়োজনে প্রাণ ধারণের দাবীতে একদা যে সিদ্ধান্ত সে গ্রহণ করেছিল তার দায়িত্ব মজিদকেই বহন করতে হয়। ধর্মের প্রতি তার সত্যিকার কোন-অনুরাগ ছিলনা বলে সাধারণ মানুষের মত ধর্মকে অবলম্বন করে সে তার এই অন্তহীন নিঃসঙ্গতার বলয় থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। তখন এক অনতিক্রম্য গ্লানিবোধে মজিদ অবিশ্রান্ত পীড়িত হয়। কিন্তু জীবনসংগ্রাম

থেমে থাকেনা। মানুষ আমৃত্যু এই সংগ্রামে লিপ্ত থাকে এবং শেষ পর্যন্তও জয়ী হবার চেষ্টা করে। ব্যক্তির এ-চেষ্টা নিরন্তর। ঈশ্বরবাদী অস্তিত্ব-বাদীরা বিশ্বাস করেন মানুষের একনিষ্ঠ লক্ষ্য 'সফল ও শক্তিশালী'[১৮] জীবন। সফল জীবনের আকাঙ্ক্ষার মানুষ তার সামর্থ্য অনুযায়ী বেঁচে থাকার সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং কর্মপন্থা নির্বাচন করে। এই "কর্মপন্থা নির্বাচন জীবনের এক আবশ্যিক ও সার্বক্ষণিক ব্যাপার। ভালো হোক আর মন্দ হোক কর্মপন্থা নির্বাচন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ মানুষকে করতেই হয়।"[১৯] কিন্তু কর্মপন্থা নির্বাচন করতে হলে মানুষকে সম্পূর্ণ স্বাধীন হতে হয়। অস্তিত্ববাদী দর্শনে এই স্বাধীনতার সংজ্ঞা ভিন্নতর। জ্যাঁ পল সার্ত তাঁর 'Existentialism and Humanism' নামের বিখ্যাত বক্তৃতাটিতে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তদনুযায়ী এর একটি অর্থ হল 'নির্বাচনের স্বাধীনতা' (To Choose)।[২০] এর সাহায্যে ব্যক্তি মানুষ তার লভ্য বস্তু পেল কিনা তার চেয়েও বৃহৎ বিবেচ্য হল নির্বাচন করার স্বাধীনতার সুযোগটি সে পেয়েছিল কিনা। নির্বাচনের প্রাক্কালে মানুষ বাহ্যিক শক্তিদ্বারা পরিচালিত হলে তার স্বাধীনতা খর্ব হয়। সার্তে মনে করেন স্বাধীন মানুষ সবকিছুই নিয়ন্ত্রণ করে কিন্তু নিজে সে নিয়ন্ত্রিত হয় না। "সার্তের মতে মানুষ হয় সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত, না হয় সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন—সে একসঙ্গে দু'রকম হতে পারেনা।"[২১]

স্বাধীনতা, আস্তিকতা ও অস্তিত্ব—এই তিনটি বিষয় হল অস্তিত্ববাদীদের মুখ্য আলোচ্য, বিবেচ্য। ওয়ালীউল্লাহ্ সম্পর্কে আজ পর্যন্ত যত নিবন্ধাদি রচিত হয়েছে তা পাঠ করে স্বতঃই প্রত্যয় জন্মে যে মনন-মানসে তিনি ইউরোপীয় চিন্তা-চেতনার সন্নিকটবর্তী মানুষ ছিলেন। তাঁর সেই মনন-মানসেরই প্রতিফলন ঘটেছে 'লালসালু' উপন্যাসে। তাঁর মানস-প্রবণতা যে অস্তিত্ববাদী দর্শনের অনুকূল তার প্রমাণ 'চাঁদের অমাবস্যা' এবং 'কাঁদো নদী কাঁদো'। এই প্রবণতারই পূর্ব-সূচনার সন্ধান পাওয়া যায় 'লালসালুর' মজিদ, তাহেরের বাপ ও জমিলা চরিত্রে।

আলোচ্য উপন্যাসটির প্রারম্ভে লেখক মাছ শিকারের যে চিত্রটি দিয়েছেন তা প্রতীকী ব্যঞ্জনায় মজিদের পরবর্তী ক্রিয়াকর্মের ইঙ্গিতবহ। তাহের-কাদেরের মত লৌহ শলাকা নয় ধর্ম-কোঁচ ধারণ করে সে ধর্মান্ধ, আবেগ-লালিত মুসলমান সমাজে অবাধে অপর্যাপ্ত শস্য ও প্রতিপত্তি শিকার করে

ফিরেছে। এখানে মজিদের ধর্ম-প্রবঞ্চনার পাশাপাশি নিরেট, নির্বোধ জীবন-বোধের প্রতীক হিসাবে নির্মিত হয়েছে আরো দুটি স্মরণযোগ্য চরিত্র—তাহেরের বাপ ও উদ্ভিন্ন যৌবনের আবার জমিলা। এই দুটি চরিত্র যেন পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। কারণ তাহেরের বাপ-চরিত্রে যে প্রতিবাদী বোধের উৎসার, জমিলায় তার পরিপূর্ণতা। এই চরিত্রদ্বয়ে লেখক তাঁর জটিল জীবনবোধ প্রকাশের সুবিধার্থে তাদেরকে মজিদের ধর্মীয় চেতনার বিপরীত কোটীতে নির্মাণ করেছেন। 'লালসালু'র প্রারম্ভের অনতিদূরে একটি গল্প আছে তাহেরের বাপ-চরিত্রকে কেন্দ্র করে। সমগ্র উপন্যাসের চালচিত্রে তাহেরের বাপের প্রসঙ্গটি অবশ্যই একটি ছোট ঘটনা। কিন্তু সামাজিক শিক্ষা-দীক্ষা ও আচার-আচরণের প্রলেপহীন এই নির্ভেজাল ব্যক্তিসত্তা যেন উপন্যাসের কেন্দ্রীয় ভাববস্তুর প্রস্তাবনা-স্বরূপ। প্রতিবাদী জমিলার পূর্বাভাষ এখান থেকেই সূচিত হয়। তাহেরের বাপ যেন অনড় অটল ব্যক্তিসত্তার প্রতীক। সারা জীবন এক বৈমাত্রেয় ভাইয়ের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদে সে এতই ব্যস্ত ছিল যে মনে হয় সে শিক্ষা-দীক্ষা বা জীবনের কোন কোমল মাধুর্য তার চারপাশে কোন আবরণ সৃষ্টি করতে পারেনি। যেমন দেহে তেমনি মনেও সে 'চ্যাঙ্গা দীর্ঘ মানুষ'। দৈহিক বৈসাদৃশ্য তার চৈতন্য জুড়েও পরিব্যাপ্ত। সমাজে বাস করেও সে অন্য দশজনের মত নয়। অন্য সবার মত মজিদের উপর তার অটল বিশ্বাস নেই। মজিদের ধর্ম-সংক্রান্ত ক্রিয়াকর্মের চৌম্বক শক্তি তাকে সামান্যতমও আকর্ষণ করেনা। মজিদের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত স্বাধীন তাহেরের বাপ জীবনকে দেখে নিত্যসত্যের স্বাভাবিক বাস্তব চর্মচক্ষে। অথর্ব স্ত্রী তাকে চরম উত্তেজক ভাষায় অকথ্য গালাগালি করলেও সে গ্লানিবোধ করেনা, আর দশজনের মত ক্রোধান্ধ হয়ে প্রতিহিংসার উন্মত্ত হয়না। পোড়-খাওয়া জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে তার যেন জানা আছে সুখবঞ্চিতা নারীর এ-আচরণ স্বাভাবিক। তার পৌরুষে আঘাত হানবার অব্যর্থ কৌশল হিসেবে স্ত্রী তার সন্তানদের পিতৃত্ব বিষয়ে কটাক্ষ করে। তবু তাহেরের বাপ থাকে অনুত্তেজিত নির্বিকার। স্ত্রীর এই নিদারুণ কটাক্ষ তার কাছে গুরুত্ব পায় তখনি যখন তা মজিদের কানে পৌঁছায়। এ-ব্যাপার নিয়ে অনুযোগের কানাগলিতে প্রবেশ না করে যুক্তি দিয়ে সে বুঝতে পারে কথাটা কার মাধ্যমে মজিদের কানে উঠেছে। কারুর পরামর্শ ছাড়া একাই সে সমাধানের কেন্দ্রে পৌঁছে যায়। নিজ কন্যা—

> হাসুনির মাকে দেখেই চড় চড় করে মেজাজ গরম হয়ে ওঠে। ঘূর্ণি খেয়ে চোখ অন্ধকার হয়ে যায়। বকের মত গলা বাড়িয়ে ছুটে গিয়ে তাকে ধরে এক আছাড়ে মাটিতে ফেলে দেয়।[২২]

মজিদের আধ্যাত্মিক শক্তিতে যখন সবার অকুণ্ঠ বিশ্বাস তখন মজিদ তার কাছে আর দশজনের একজন অতি সাধারণ মানুষ। মজিদের মিহি চিক্কন কোরান তেলাওয়াত অথবা লালসালুতে আবৃত মাজার তার চিত্তে ভীতির কম্পন জাগায় না। খালেক ব্যাপারীর মত প্রতিপত্তিশালী মাতব্বরও মজিদের ইঙ্গিতে নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু তাহেরের বাপ থেকে যায় নিয়ন্ত্রণ-বহির্ভূত। মজিদ আপ্রাণ চেষ্টা করেও তাহেরের বাপকে করায়ত্ত করতে পারেনা। এমন সময় সুযোগ আসে। তাহেরের মা অসতর্ক মুহূর্তে যে কথা বলে ফেলেছে মজিদ তাকে ব্যবহার করে তাহেরের বাপকে হাতের মুঠোয় আনতে চায়। তখন এই পিতৃত্ব-প্রশ্ন মীমাংসার জন্য জমায়েত ডাকা হয়। ব্যাপারটা তাহেরের বাপের একদম ভালো লাগেনি। কিন্তু তবু তাকে জমায়েতে যেতে হয়। মূল জমায়েত থেকে একটু দূরে, মনে হয় মজিদের ধর্মভীতির মোহজালের আওতা থেকে একটু দূরে সরে বসে তাহেরের বাপ। শুরু হয় খালেক ব্যাপারীর প্রশ্ন। তার সাজানো গুছানো অভি-যোগের উত্তরে তাহেরের বাপ ছুঁড়ে ছুঁড়ে দেয় অনাবৃত সত্য কথার ধারালো বল্লম। এই উত্তর-প্রত্যুত্তরের ক্রমধারায় বেরিয়ে আসে তার অসংস্কৃত অমা-র্জিত জেদী প্রকৃতি। সামাজিক সৌজন্যবোধের কোন অন্তরাল তার সামনে থাকেনা। সমাজে অবস্থান করেও সে যেন সমাজ-বহির্ভূত এক আদিম উদোম মানুষ। অর্থহীন অর্বাচীন উত্তর-প্রত্যুত্তরে ভিতরে ভিতরে উত্যক্ত হয়ে ওঠে তাহেরের বাপ। মজিদ ভেবেছিল ব্যাপারটা খুবই সামান্য এবং তুচ্ছ একটা অভিযোগেই তাহেরের বাপকে কাবু করে ফেলা যাবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে খালেক ব্যাপারী এঁটে উঠছেনা দেখে আসরে নামে স্বয়ং মজিদ। সে ধর্মীয় উদ্ধৃতি ও ব্যাখ্যার মারপ্যাঁচে এমন এক ধূম্রজাল সৃষ্টি করে যে তা এবারে তাহেরের বাপকে আফিমের নেশার মত আকণ্ঠ আচ্ছন্ন করে ফেলে :

> যে লোকটা এতক্ষণ একটা বিদ্রোহী ভাব নিয়ে কঠিন হয়ে ছিল তারও চোখ এখন নরম। বসে থাকার মধ্যে উদ্ধত ভাবটাও যেন নেই। চোখাচোখি হতে সে চোখ নামায়।[২৩]

অনেকটা যেন জ্বরো-রুগির মত কাবু হয়ে ঝিম মেরে যায় সে। মজিদের 'অন্তরের শক্তিতে' তার বিন্দুমাত্র আস্থা না থাকলেও তার 'মিহি মধুর' কেরাত, কোরান হাদিসের ব্যাখ্যান, তার সুরেলা কণ্ঠস্বরের লাবণ্য শেষাবধি তাহেরের বাপকে একদম কোনঠাসা করে ফেলে। ধর্মের মোহন কুয়াশা ইন্দ্রজালের মত তার উপর বিস্তৃত হয়। এতক্ষণ যে লোকটা একটা কঠিন-কঠোর জীবন্ত প্রতিবাদ হয়ে অবস্থান করছিল সে যেন ভেঙে গুঁড়িয়ে যেতে থাকে। এমন কি এক পর্যায়ে দ্বিধায় তার মুখ ঝুলে পড়ে এবং সে অবিশ্রান্ত কান্নায় ভেঙে পড়ে। মজিদ-ব্যক্তিত্বের গুরুভার শিলার চাপে তার নিখাদ 'আমিত্ব', তার স্বাভাবিক স্বাধীন অস্তিত্বের অহংকার নিয়ন্ত্রিত হয়। তার মধ্যকার একরোখা ব্যক্তিসত্তাটি যেন তার অজ্ঞাতসারে ক্রমানুয়ে নমিত হতে থাকে। কিন্তু বাড়ী ফিরে স্বগৃহে নির্জনতায় দাঁড়িয়ে পুনর্বার সে নিজেকে খুঁজে পায়। মনে হয় তার নিঃসঙ্গ একান্ত গৃহকোণ যেন মজিদের ধর্মীয় আবহের প্রভাবমুক্ত একান্তই তার নিজের নিলয়: "বুড়ো বাড়ী ফিরে সটান শুয়ে পড়ে। তারপর চোখ বুঁজে চুপচাপ ভাবে। মাথাটা যেন খোলাসা হয়ে এসেছে।"[২৪] মজিদের ধর্মীয় আফিমের নেশা যখন তার রক্ত থেকে পুরোপুরি অন্তর্হিত হয় তখন অকস্মাৎ তার চেতনায় এক অভূতপূর্ব যন্ত্রণার লাভা সাগ্নিক প্রমত্ততায় লেলিহান হয়ে ওঠে। সকল লাঞ্ছনার মূল বৃদ্ধা স্ত্রীকে চেলাকাঠ দিয়ে পিটিয়ে নিঃশেষ করতে ইচ্ছে হয়। হৃদয়ে যন্ত্রণার দাবদাহ ক্রমশঃই দেদীপ্য হয়ে ওঠে। আর :

> আকাশে দুরন্ত হাওয়া আর দলে দলে ভারী কালো মেঘে লড়াই লাগে, মহব্বতনগরের সর্বোচ্চ তালগাছটি বন্দী পাখীর মত আছড়াতে থাকে।[২৫]

তাহেরের বাপের বিপন্ন অস্তিত্বই কি এই বন্দী পাখী? মজিদের মিথ্যাশ্রয়ী প্রতিপত্তির গুহ্যমন্ত্রটির সন্ধান সে অনুভব করেছিল। তাই মজলিশে তার উষ্মা প্রকাশিত হয় নির্বিকার প্রত্যুত্তরে। সামাজিক মর্যাদাহীন অথর্ব বৃদ্ধ তাহেরের বাপের পক্ষে মজিদের প্রতিষ্ঠা বিষয়ে প্রশ্ন করা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া যুবক আক্কাসের পরাজয়ের দৃষ্টান্ত ছিল তার চোখের সামনে। তাই সংকট মুহূর্তে একাকীই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সে। এবং পরিচিতি জনসমাজ থেকে চিরদিনের জন্য হারিয়ে যায়। এ সবই ঘটে নিঃশব্দে।

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে ধর্ম একটি বিশেষ প্রভাবশালী শক্তি। মজিদ এই শক্তিকে অবলম্বন করে তার অস্তিত্বকে জিইয়ে রাখে। মহব্বতনগরের সর্বত্র নিরঙ্কুশ প্রতিপত্তির শেকড় ছড়ালেও তার সকল জৌলুসের কেন্দ্রস্থলে আছে এক অদ্ভুত শূন্যতা। নিজে শিকারী হয়েও অহরহ এক অসহায় যন্ত্রণার শিকার হয় সে। অস্তিত্বের ধারাবাহিকতা রক্ষার অক্ষমতা প্রতি-মুহূর্তে কীটের মত দংশন করে তাকে। অবচেতনার দমিত যৌনাকাঙ্ক্ষা এই যন্ত্রণাকে আরো উচ্চকিত করে তোলে। তার চোখ তখন নিঃশব্দে লেপ্টে থাকে আমেনার 'সাদা মসৃন' নগ্ন পায়ে, হাসুনির মার অনাবৃত পিঠের লাবণ্যে। 'এখানেই চরিত্রটির মগ্ন চৈতন্য প্রকাশ পায়।'[২৬] মজিদের যৌন অতৃপ্তির প্রতিকার রূপে এবং সন্তান কামনার নিঃশব্দ আর্তির রন্ধ্রপথে তার সংসারে প্রবেশ ঘটে এ-উপন্যাসের স্ফুটতর প্রতিবাদী চরিত্র 'চাঁদের মত এক ফালি' জমিলার। উপন্যাসের প্রায় শেষাংশে আবির্ভূত বলে তার অবস্থান ও পরিচয়ের ব্যাপ্তি মজিদ বা রহিমার মত দীর্ঘ বিলম্বিত নয়। কিন্তু স্বল্পাবস্থানেই এ-চরিত্রের অবিশ্বাস্য আচরণ ও প্রায়ান্ধকার কৌণিক বাঁক স্বতঃস্ফূর্তভাবে পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করে। ধর্মান্ধ সমাজে বাস করেও তার প্রদীপ্ত ঔদ্ধত্য পাঠকের প্রশ্নহীন প্রশ্রয় লাভ করে। মাজারের গায়ে পা ঠেকানোর মত অবিশ্বাস্য আচরণও বিশ্বাস্য করে উপস্থাপনার কারণে মার্জনা লাভ করে। লেখক জমিলাকে তাহেরের বাপের সমান্তরালে কিন্তু মজিদের পুরোপুরি বিপরীত একটি চরিত্র হিসাবে নির্মাণ করেছেন। জমিলার আগমন এবং অবস্থান মজিদের প্রভুত্ব-সীমানায় হলেও তার সমগ্র প্রভাব একত্রিত করেও মজিদ তাকে অভিভূত করতে পারেনি। বিবাহের রাত্রি থেকে শেষাবধি জমিলা কখনো মজিদকে দেখে শ্রদ্ধাপ্লুত বা ভীতিবিমূঢ় হয়ে পড়েনি। এ-গ্রন্থে জমিলার ভূমিকা দুঃসাহসীর। মিথ্যাশ্রয়ী মজিদ তথা মাজারের মত নিশ্চেতন সমাজের বিরুদ্ধে তার বিদ্রোহ-বহ্নি জ্বলতে থাকে নিঃশব্দে। আমেনার প্রতি অন্যায় শাস্তির প্রতিবাদ করার মত সাহস খালেক ব্যাপারীর নেই। তাহেরের বাবা নিষ্ফল আক্রোশে ঘরছাড়া হয়। কারণ শাস্তির নির্দেশ আসে নির্মম প্রভুর মত কঠিন মজিদের কাছ থেকে। কিন্তু ক্ষমতাধর মজিদের সহজ প্রভুত্বের অহংকার অকস্মাৎ প্রহত হয়। জমিলা তার আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রচণ্ড প্রবাহে কঠিন শিলাখণ্ডের মত এক অনড়-অটল চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এখান থেকেই সূচিত হয় দুই বিবাদমান অস্তিত্বের মুখোমুখি সংঘর্ষ। আর

কেউ বোঝার আগে জমিলার নিঃশব্দ অবহেলা চোখে পড়ে একমাত্র মজিদের। প্রথমতঃ, মিথ্যা-নির্ভর আধিপত্য নিয়ে প্রতিমুহূর্তে উৎকণ্ঠিত বলে জমিলার সামান্য অবহেলাও তার চোখ এড়ায়না। দ্বিতীয়তঃ, সমাজের সর্ব-শ্রেণীর মানুষের মনোযোগ তৎক্ষণাৎ ও অবধারিতভাবে পেয়ে অভ্যস্ত বলে তার প্রতি জমিলার নির্বিকার ঔদাসীন্য তাকে প্রথমাবধি আহত সচেতন করে রাখে। একটা বিষয় লক্ষ্য করার মত, প্রতিবাদী এই চরিত্রটির যাবতীয় প্রতিবাদই সংঘটিত হয় নিঃশব্দে। সে নামাজ পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়ে, ভাবতন্ময় জিগিরের উত্তাল ধ্বনিতরঙ্গে আকৃষ্ট হয়ে ঘোমটাবিহীন মাথায় বাইরে বেরিয়ে যায়। মজিদের মুখে থু থু দেয় এবং ঘুমের ঘোরে তার পা মাজারের গায়ে ঠেকে। এ-সবই ঘটে অত্যন্ত নিঃশব্দে। জীবনকে যেমন পোষ মানিয়ে কোন বিশেষ আধারে আবদ্ধ রাখা যায়না তেমনি মজিদের পক্ষে জমিলাকে কোন শিক্ষা দেয়াই সম্ভব হয়না। প্রাণ-ধর্মের নিজস্ব আদিম অকৃত্রিম নিয়মে সে মজিদের মুঠো থেকে বার বার ফস্কে গিয়েছে। সহজ জীবনাবেগে জন্মাবধি লালিত-বর্ধিত এক অনমনীয় দৃঢ়তা তার চরিত্র-বৈশিষ্ট্য। বলা যায় : "মজিদের হিতোপদেশ বা হুঙ্কার তাকে বিচলিত করেনি, কখনো অবসন্ন করেছে, কখনো করেছে বিদ্রোহী।"[২৭]

এ-গ্রন্থে জমিলা এক নির্বোধ নিরেট জীবনের প্রতীক। জমিলা যা, জমিলা তাই-ই। শিক্ষা-দীক্ষা আচার-অনুষ্ঠান বোধ-বিবেচনা-বিশ্বাস কোন কিছুই তার প্রকৃতির মত সত্য-সত্তাকে আচ্ছাদিত-দমিত করতে পারেনা। মজিদের আগ্রাসী প্রভুত্ব জমিলার অস্তিত্বে অন্তঃশীল ধারার মত প্রবাহিত যে সত্তা তার নাগাল পায়না। নির্ভেজাল অনিয়ন্ত্রিত ব্যক্তি-সত্তার যথার্থ স্বরূপে জমিলা প্রতি মুহূর্তে উদ্ভাসিত। তার আজন্ম স্বাধীনতা কেড়ে নিয়ে রহিমার মত তাকেও গৃহপালিত করার মজিদের সকল প্রচেষ্টাই একে একে ব্যর্থ হতে থাকে। মহব্বতনগরের জনস্তূপের দৃষ্টি থেকে যে ফাঁকটুকু মজিদ সযত্নে আড়াল করে আসছিল বিদ্রোহিণী জমিলার কাছে তা যেন কখন উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছে। জীবনোপভোগের বিচিত্র আকাঙ্ক্ষায় বালিকা জমিলাকে সে ঘরে এনেছিল। কিন্তু একদিন :

> প্রাণোচ্ছল বালিকা জমিলাই যেন মজিদের প্রতিদ্বন্দ্বীর ভূমিকা নেয়।[২৮]

মজিদ হতচকিত বিমূঢ়। শেষ পর্যন্ত তার সিদ্ধান্ত হল "ওর দিলে খোদার ভয় নেই।"[২৯] জমিলা তখন তার কাছে হয়ে দাঁড়ায় এক অলঙ্ঘনীয় সমস্যা। তাকে করতলগত করার সব কৌশলই ব্যর্থ হয়। জমিলার হৃদয় যেন এক টুকরো অঙ্কন-চিহ্ন-রিক্ত সফেদ কাগজ। মজিদের কোন আচরণই তাতে সামান্যতম দাগ ফেলতে পারেনা। নবজাত শিশুর চৈতন্যে যেমন জাগতিক অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা-সংস্কারের কোন দাগ থাকেনা জমিলাও যেন তেমনি। লেখক তার ইঙ্গিতও দিয়েছেন :

> রহিমার প্রশস্ত বুকে মুখ গুঁজে জমিলা অঘোরে ঘুমাচ্ছে। কুপি-টার- লালচে আলো মুখে পড়তেই তার ঠোঁটটা একটু নড়ে উঠল। যেন মাই খেতে খেতে ভুলে থেমে গিয়েছিল। আলো দেখে হঠাৎ স্মরণ হল সে কথা।[৩০]

গ্রন্থের এই অংশে এসে মজিদ যেন জীবনের শাশ্বত শক্তির মুখোমুখি দাঁড়ায়। মজিদের সংস্কার-বিশ্বাস-প্রতিষ্ঠা এখানে এই মুহূর্তে সমূল উৎপাটিত। জন্মস্বাধীন প্রতিটি মানুষের মধ্যে অন্তঃশীল ধারার মত যে সত্তা বিরাজিত মানুষের জীবনাভিজ্ঞতা তার উপর আবরণের সৃষ্টি করে। মানুষের পরি-চয় অসংখ্য। ব্যক্তি-মানুষ একাধারে ঘরোয়া, সামাজিক, রাজনৈতিক, এমনকি আন্তর্জাতিক। অস্তিত্ববাদীদের মতে মানুষের এ-পরিচয় স্বাভাবিক নয়। তারা বিশ্বাস করেন মানুষ যে মুহূর্তে সমাজবদ্ধ সে-মুহূর্তেই সে পরাধীন ও বিকৃত। কিন্তু মানুষ যখন একাকী নিজের অন্তঃশীল সত্তার মুখোমুখি দাঁড়ায় একমাত্র তখনি সে স্বাধীন ও স্বাভাবিক। মানুষের বিভিন্ন পরিচয়ের অন্তরালে আছে তার শাশ্বত সত্য পরিচয়। যে-পরিচয় জন্ম-মুহূর্ত থেকেই মানুষ বহন করে চলে আমৃত্যু। মানুষের অন্তঃস্থিত এই স্বাধীন সত্তা সঙ্কটে-যন্ত্রণায় প্রেরণা হয়ে উত্তরণের পথ-নির্দেশ করে। জমিলা জন্ম-স্বাধীন। মজিদ যখন তাকে ঘুম থেকে টেনে তুলে মাজারের দিকে নিয়ে যায় তখন দৈহিক বলে পরাস্ত জমিলা মজিদের মুখে থুথু নিক্ষেপের মাধ্যমে তার বিদ্রোহের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। তবু মজিদ জমিলাকে মাজারে নিয়ে যায়। মাজারে ঢোকার পূর্বে এবং পরেও জমিলার চোখে ভীতির মেঘ যেন ঘন হতে থাকে। উত্তেজনা ও ভীতির চরম অবস্থায় 'অসাড় হয়ে যাওয়া' জমিলাকে খুঁটির সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখে আসে মজিদ। কিন্তু তার উদ্বেগাকুল দীর্ঘ রাত জমিলার ভীতি-বিহ্বল

আর্তনাদের অভাবে ব্যর্থ হয়। সকালে আবিষ্কৃত হয় গভীর ঘুমে অচৈতন্য জমিলার মেহেদি-রাঙা পা ঠেকে আছে মাজারের গায়ে। অন্তঃসারশূন্য ধর্মানুষ্ঠান তথা পচন ধরা পুরাতন সমাজের বিরুদ্ধে জমিলার বিদ্রোহ এভাবেই বিস্ফোরিত হয়। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'বহিপীর' নাটকেও এই বিদ্রোহের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। প্রথম উপন্যাস 'লালসালু'র মত প্রথম নাটক 'বহিপীরে'ও ওয়ালীউল্লাহ্ রোগাক্রান্ত সমাজের নিরাময়-যোগ্য ক্ষত স্থানটির প্রতিই অঙ্গুলী নির্দেশ করেছেন। তবে জমিলার বিদ্রোহ প্রতীক ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত বলে তা পরোক্ষ। কিন্তু তাঁর প্রথম নাটক 'বহিপীরে' তাহেরা ইচ্ছাকৃতভাবে পদাঘাত করেছে পীর-মোল্লা কবলিত সনাতন সমাজকে, তাহেরার সচেতন পা এসে সশব্দে লাগে বহিপীরের শরীরে। এ-বিদ্রোহ প্রত্যক্ষ ও প্রচণ্ড—এ বিদ্রোহ দুর্বিষহ।"৩১

তাহেরার মত জমিলার বিদ্রোহ সরাসরি প্রকাশিত না হলেও প্রশ্ন থাকে সর্বত্র সম্মানিত মজিদের মুখে থুথু দেয়া বা অজানা অচেনা একটি কবরের পাশে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ার দুঃসাহস সে পেল কোথায়। দুর্যোগপূর্ণ রাতের ঘন অন্ধকারে একাকী নির্জন ঘরে কিশোরীর ভীতি কে হরণ করল। উপন্যাসের প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্রের অন্তরালে লেখক সূক্ষ্ম ইঙ্গিতে এর জবাব দিয়েছেন। এ-ছাড়াও গ্রন্থটির সর্বত্র তিনি ধানকে প্রতীকী ব্যঞ্জনায় ব্যবহার করেছেন। সম্ভবত এখানে তিনি ধানকে শাশ্বত জীবনের—Concrete reality-র প্রতীক হিসেবে নির্মাণ করতে চেয়েছেন। মজিদের মিথ্যাশ্রয়ী ধর্মীয় সত্তার জীবনীশক্তি এই ধানক্ষেতে প্রোথিত। মহব্বতনগরের সকল মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ধানক্ষেত যেন এক অপ্রতিরোধ্য শক্তি হয়ে বিরাজ করে। খোদাতালাকে পাঁচ বেলার নামাজে তুষ্ট রেখে তারা তাদের অখণ্ড মনোযোগ অর্পণ করে ধানক্ষেতে। কেননা মাটির মত বড় সত্য আর কিছু নেই। মানুষের শাশ্বত চৈতন্য এখানে যেন মৃত্তিকারূপী। এ-গ্রন্থে জমিলা এবং তাহেরের বাপের অস্তিত্বের যে পরিচয় বিধৃত তা যেন আবহমান কালের মাটির মত ধানের মত নিরেট সত্য। একদিকে ধর্ম-বর্ম পরিহিত মজিদ, অন্যদিকে মানুষের স্বাধীন সত্তার ধারক তাহেরের বাপ ও জমিলা—এই দুই reality-র দ্বন্দ্বই আলোচ্য-গ্রন্থে ঔপন্যাসিক-দক্ষতায় উদ্ভাসিত। প্রকৃতপক্ষে এ-উপন্যাসে ওয়ালীউল্লাহ্ যে দার্শনিক চিন্তাধারার সূত্রপাত করেছেন, তাঁর পরবর্তী উপন্যাসদ্বয়ে

সে-চিন্তাধারা আরো বৈচিত্র্যমণ্ডিত ভাবে ও নৈপুণ্যের সঙ্গে পরিবেশিত হয়েছে। কারণ 'লালসালু' রচনার বহুকাল পরে তিনি 'চাঁদের অমাবস্যা' ও 'কাঁদো নদী কাঁদো' রচনা করেন। তখন তিনি বাস করছেন পশ্চিম ইউরোপে—যেখানে 'অস্তিত্ববাদ' প্রতিটি শিক্ষিত বিদগ্ধ মানুষকে প্রবলভাবে আলোড়িত করছে। ইউরোপে তখন "সার্ত-ক্যামু-কাফ্কা সর্বাধিক পঠিত লেখক।"[৩২] 'লালসালু'র ইংরেজী অনুবাদের বর্ধিতাংশ দেখে অনুমান করা যায় অস্তিত্ববাদী দর্শন তাঁকেও নাড়া দিয়েছিল। সার্ত-ক্যামু-কাফ্কার পাঠক হিসেবে অস্তিত্ববাদী চিন্তা-চেতনা যে তাঁর মনীষাকে আরো অধিক ঋদ্ধি ও পরিপক্কতা দান করেছিল 'চাঁদের অমাবস্যা' ও 'কাঁদো নদী কাঁদো'ই তার প্রমাণ।

তথ্যসঙ্কেত

১ শওকত ওসমান, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, দেশ, ১৫ই জানুয়ারী, ১৯৭২।

২ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, লালসালু, নবম মুদ্রণ, ১৯৭৯, পৃ. ৯৩

৩ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, কালের প্রতিমা, কলিকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৩৮১, পৃ. ১৬৫

৪ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, লেখকের কথা, কলিকাতা, নিউ এজ, ১৯৫৭।

৫ শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত।

৬ সৈয়দ আবুল মকসুদ, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র জীবন ও সাহিত্য, ১ম প্রকাশ-১৯৮১, পৃ. ১৫০-৫১

৭ সৈয়দ আবুল মকসুদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫১

৮ শিবনারায়ণ রায়, ঔপন্যাসিকের বিবেক: সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, শারদীয় প্রতিক্ষণ-১৩৯১।

৯ সৈয়দ আলী আহসান, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সম্পর্কে, বই, মার্চ সংখ্যা—১৯৮১।

১০ আবুল হোসেন, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, সময়, অষ্টম সংখ্যা ১৩৮৬।

১১ কাজী মোস্তায়ীন বিল্লাহ্, নিঃশব্দ ঘূর্ণিঝড়: সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র চাঁদের অমাবস্যা, বাংলা একাডেমী গবেষণা পত্রিকা, ঢাকা, শ্রাবণ-পৌষ, ১৩৮৩।

১২ সেলিনা হোসেন, পিতৃভূমিতে পর্যটক, উত্তরাধিকার, অক্টোবর-ডিসেম্বর—১৯৮৪।

১৩ সরদার ফজলুল করিম, দর্শনকোষ, ১ম প্রকাশ—১৯৭৩।

১৪ লালসালু, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১

১৫ আবুল হোসেন, পূর্বোক্ত।

১৬ লালসালু, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯

১৭ লালসালু, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯

১৮ আমিনুল ইসলাম, অস্তিত্ববাদ : কিয়ের্কেগার্ড ও সার্ত্রে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, জুন—১৯৭৯।

১৯ আমিনুল ইসলাম, পূর্বোক্ত।

২০ Jean Paul Sartre : 'Existentialism and Humanism'. Translation & introduction by Philip Mairet. First English Edition, Published in 1948 By Eyre Methuen Ltd. London, pp. 31–32

২১ নীরুকুমার চাকমা, অস্তিত্ববাদ : কয়েকটি দিক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, জুন ১৯৭৯।

২২ লালসালু, পৃ. ২৫

২৩ লালসালু, পৃ. ২৯

২৪ লালসালু, পৃ. ৩২

২৫ লালসালু, পৃ. ৩৮

২৬ দেবীপদ ভট্টাচার্য, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাস : দ্বিতীয় চিন্তা, ভাষা-সাহিত্য-পত্র—১৩৮৫।

২৭ সিদ্দিকা মাহমুদা, লালসালু, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৮৮।

২৮ দেবীপদ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত।

২৯ লালসালু, পৃ. ১০৩

৩০ লালসালু, পৃ. ৯৯

৩১ সৈয়দ আবুল মকসুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭

৩২ সৈয়দ আবুল মকসুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১

সহায়ক গ্রন্থাবলী

১ শিবনারায়ণ রায়, কবির নির্বাসন ও অন্যান্য ভাবনা, কলিকাতা, প্রকাশ ভবন, ১৯৭৩।

২ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, কালের প্রতিমা, দে'জ পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা, ১৩৮১

৩ সৈয়দ আবুল মকসুদ, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবন ও সাহিত্য, মিনার্ভা, ঢাকা, ১৯৮১।

৪ 'Existentialism form Dostoevsky to Sartre'. Edited, with an introduction, Prefaces, and new translations by walter Kaufmann. 27 th Printing, 1969.